بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ মে, ২০২৩ মোতাবেক ১২ হিজরত, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (সূরা আলে ইমরান : ১৬০)

(এই) আয়াতের অনুবাদ হলো, অতএব আল্লাহ্‌র পরম কৃপায় তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছো, আর তুমি যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ হতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। অতএব (তুমি) তাদের মার্জনা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। এরপর তুমি যখন (কোনো বিষয়ে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো তখন আল্লাহ্‌রই ওপরই ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাঁর প্রতি) ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।

আজকাল বিভিন্ন দেশে জামা'তের মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে শূরা হয়ে গেছে, কোথাও এই সপ্তাহে হবে আবার কোনো কোনো দেশে হবে আগামী সপ্তাহে। আজ থেকে এ (খুতবার) মাধ্যমে জার্মানীতে শূরা আরম্ভ হচ্ছে, একইসাথে আরো অনেক দেশ রয়েছে (যেখানে শূরা অনুষ্ঠিত হচ্ছে)। অনুরূপভাবে যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য কিছু দেশে মজলিসে শূরা আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে।

শূরার গুরুত্ব এবং প্রতিনিধিবৃন্দের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে আমি পূর্বেও বিভিন্ন খুতবায় মনোযোগ আকর্ষণ করেছি, কিন্তু এখন যেহেতু (এরপর) কয়েক বছর কেটে গেছে তাই আমি আজ পুনরায় এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ, মহানবী (সা.)-এর আদর্শ এবং জামা'তের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি অনুসারে কিছু বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি। যেসব স্থানে (ইতঃমধ্যে) শূরা হয়ে গেছে সেখানকার শূরার প্রতিনিধিবৃন্দও এসব কথা থেকে উপকৃত হতে পারেন, যা শূরার প্রতিনিধিদের দায়দায়িত্বের প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিদের স্মরণ রাখা উচিত, কেননা প্রতিনিধিবৃন্দের কতক দায়দায়িত্ব মজলিসে শূরার বিভিন্ন সুপারিশ এবং সে বিষয়ে খলীফার সিদ্ধান্ত প্রদানের পরেই আরম্ভ হয়, আর সেগুলো সম্পাদন করা এবং নিজেদের ভূমিকা পালন করা শূরার প্রত্যেক প্রতিনিধির জন্য আবশ্যক। যাহোক, এসব দায়দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার পূর্বে আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তার আলোকে কিছু বিষয় উপস্থাপন করব এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ এবং তাঁর রীতি-পদ্ধতি তুলে ধরব। এই আয়াতে যেখানে এ বিষয়ের সত্যায়ন করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে উম্মতের জন্য পরম কোমলচিত্ত ছিলেন, সেখানে এ বিষয়ের প্রতিও আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, যাদের ওপর মহানবী (সা.)-এর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব, সেইসাথে তাঁর (সা.) বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর (সা.) দাসত্বে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর মিশন বাস্তবায়ন করাও (যাদের দায়িত্ব), তাদের উচিত ভালোবাসা, প্রীতি ও কোমলতার ভিত্তিতে কাজ করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি কোমলতা প্রদর্শন না করো বরং কঠোরচিত্ত ও ক্রোধান্বিত হও তাহলে এসব লোক দূরে

চলে যাবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা মার্জনা করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন আর একইসাথে পরামর্শ করারও নির্দেশ প্রদান করেছেন।

কাজেই, এই নীতি ও শিক্ষা অনুসারে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু যেমনটি নাম থেকে সুস্পষ্ট, এটি পরামর্শসভা মাত্র, সিদ্ধান্ত প্রদানকারী নয়। এজন্যই (আল্লাহ্ তা'লা) বলেছেন, পরামর্শের পর তুমি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আর আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করা হলে তিনি তার ফলাফলও অত্যন্ত আশিসময় প্রকাশ করবেন। খোদানির্ভরতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিসত্তায় দেখতে পাই। মহানবী (সা.) অনেক বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সরাসরি দিক-নির্দেশনা লাভ করতেন। কিন্তু বিশেষভাবে সেসব বিষয়ে তিনি (সা.) অবশ্যই পরামর্শ চাইতেন, যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা থাকত না। তাঁর (সা.) এই কর্মপন্থা এবং আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ আমাদেরকে এটি বোঝানোর জন্য যে, জামা'তের সদস্যদের সাথে কর্মকর্তাদের আচারব্যবহার কেমন হওয়া উচিত। অধিকন্তু এজন্যও যে, আমাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, আহমদীয়া জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের নেয়ামতে ভূষিত করেছেন, তাই যুগ-খলীফাও আল্লাহ্ তা'লার আদেশ এবং মহানবী (সা.)-এর রীতি অনুসারে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জামা'তের নিকট থেকে স্থানীয় অবস্থানুসারে পরামর্শ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে সকল বিষয়ে মহানবী (সা.)-কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ করার নির্দেশ প্রদান আর কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর (সা.) পরামর্শ গ্রহণ করা সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান, অধিকন্তু উম্মতের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, যখন شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, যদিও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এর ঊর্ধ্বে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এটিকে আমার উম্মতের জন্য আশীর্বাদ বানিয়েছেন। অতএব, এদের মধ্য হতে যারা পরামর্শ করবে তারা সঠিক পথ ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকবে না। কিন্তু যারা পরামর্শ করবে না তারা লাঞ্ছনা এড়াতে পারবে না। সুতরাং, মহানবী (সা.) নিঃসন্দেহে এসব পরামর্শের ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং আছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেছেন যেন উম্মতের জন্য সেই আদর্শ রেখে যেতে পারেন যার কল্যাণে উম্মত চিরকাল ঐশী কল্যাণরাজি লাভ করতে পারে, সবসময় সত্য ও হেদায়েতের পথে চলমান থাকে আর লাঞ্ছনা হতে নিরাপদ থাকে। এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমাদের মাঝে শূরার ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে। অতএব সাধারণত প্রত্যেক আহমদীর আর বিশেষভাবে শূরার প্রত্যেক সদস্যের উচিত এর মূল্যায়ন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। কেননা তিনি আমাদের জন্য হেদায়েত ও সঠিক পথ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেছেন। মহানবী (সা.) কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন আর তাঁর পরামর্শ (গ্রহণের) রীতি কী ছিল– এ সম্পর্কে ইতিহাস থেকে আমরা যা জানতে পারি তার কিছুটা বর্ণনা করছি। খোলাফায়ে রাশেদীনও সেই রীতিই অব্যাহত রেখেছেন আর এরপর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও একই রীতি অনুসরণ করেছেন।

সাধারণত পরামর্শ গ্রহণের তিনটি রীতি আমরা দেখতে পাই। একটি রীতি ছিল, পরামর্শের যোগ্য কোনো বিষয় সামনে এলে তখন এক ব্যক্তি লোকজনের সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিত, তখন লোকজন জড়ো হতো। এরপর যে মতামত (প্রদান করা) হতো,

যে পরামর্শ (দেওয়া) হতো সে সম্পর্কে মহানবী (সা.) অথবা খলীফাগণ সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন যে, এসব পরামর্শের ভিত্তিতে এটি হলো আমাদের সিদ্ধান্ত, আর এভাবে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। সেই যুগে যেহেতু মাতব্বরি প্রথা ছিল তাই যদিও গোত্রের লোকেরা সমবেত হতো, অনেক মানুষ জড়ো হতো, তবে সাধারণত গোত্রপতি কিংবা আমীর-ই পরামর্শ প্রদান করতেন; তাদের একজন প্রতিনিধি থাকত। মানুষ এতে সানন্দে সহমত হতো যে, আমাদের নেতা বা আমীর আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে মতামত ব্যক্ত করবেন। বরং সেই যুগের রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ যদি আবেগের বশে ব্যক্তিগত মতামত দেয়ার চেষ্টাও করত তাহলে মহানবী (সা.) বলতেন, তোমার নেতা বা আমীরকে বলো, সে যেন এগিয়ে এসে নিজের মতামত প্রদান করে–তোমার কথার তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। অতএব এ ছিল একটি রীতি। দ্বিতীয় রীতি ছিল এটি যে, যাদেরকে মহানবী (সা.) পরামর্শ দেয়ার যোগ্য মনে করতেন তাদেরকে ডেকে নিতেন এবং গণহারে সবাইকে ডাকা হতো না। এরপর কয়েকজনের বৈঠক বসতো আর পরমার্শ নেয়া হতো। তৃতীয় পদ্ধতি হলো, যেখানে মহানবী (সা.) মনে করতেন, দুই ব্যক্তিরও এক স্থানে একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সেখানে তিনি (তাদেরকে) পৃথকভাবে ডেকে পরামর্শ নিতেন। প্রথমে একজনকে ডেকে পরামর্শ নিতেন এরপর দ্বিতীয় জনকে ডেকে পরামর্শ নেয়া হতো। যাহোক তাঁর (সা.) পরামর্শ গ্রহণের এই ছিল তিনটি রীতি। আর খুলাফায়ে রাশেদীনও এই রীতি অনুযায়ীই পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) এসব পরামর্শের মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে, তিনি (সা.) বিভিন্ন উপলক্ষ্যে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। সত্য কথা হলো, তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছ থেকে অনেক বেশি পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর চেয়ে অধিক আর কাউকে নিজ সাথীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে দেখিনি। এর কারণ হলো, যেমনটি আমি বলেছি, যদি আল্লাহ্ তা'লার নবী, যিনি সরাসরি আল্লাহ্ তা'লার দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকেন, তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেন– তাহলে তোমাদের পরামর্শ গ্রহণের গুরুত্বকে কতটা অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত! তাঁর (সা.) পরামর্শ গ্রহণের একটি ঘটনা উপস্থাপন করছি।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি (সা.) অনেক সাহাবীর কাছে পরামর্শ চান। সেই সাহাবীদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), তালহা (রা.), যুবায়ের (রা.) এবং আরও অনেক সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, মহানবী (সা.) আমাদের কাছে পরামর্শ না চাইলেও আমরা উচ্চবাচ্য করতাম না। তখন তিনি (সা.) বলেন, যেসব বিষয়ে আমার প্রতি ওহী হয় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমি তোমাদের মতোই হয়ে থাকি। মুআয (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এর উক্তি 'আমাকে পরামর্শ দাও'– এর অনুবর্তিতায় মহানবী (সা.) যখন পরামর্শ গ্রহণ করছিলেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করে। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, মুআয! তুমি বলো, তোমার মতামত কী? তখন আমি বলি, আমার মতামত তা-ই যা হযরত আবু বকর (রা.)-এর মত। অতএব তিনি (সা.) তাকেও জিজ্ঞেস করেছিলেন।

সুতরাং মহানবী (সা.)-এর এই অভিব্যক্তি একদিকে যেমন তাঁর সরলতা ও বিনয় এবং পরামর্শের গুরুত্বকে স্পষ্ট করে, তেমনিভাবে এটি আমাদের জন্যও এক উত্তম আদর্শ যে, পরামর্শ করাকে আমাদের কতটা গুরুত্ব প্রদান করা উচিত! সাহাবীদের আদর্শ আমাদের সামনে স্পষ্ট করে যে, তারা যখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে পরামর্শ দিতেন তখন নিজ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাকওয়ায় প্রতিষ্ঠিত থেকে পরামর্শ প্রদান করতেন।

মদিনায় হিজরতের পরও মক্কার কাফেররা যখন মুসলমানদের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে তখন মহানবী (সা.) এটিকে প্রতিহত করার জন্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন আর আনসার ও মুহাজের সর্দারদেরও এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর মুহাজের ও আনসারদের সর্দারদের পরামর্শ ও সম্মতিতে তিনি বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আনসার সর্দাররা এই পরামর্শ প্রদানকালে যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং অঙ্গীকার করেছেন তাতে মহানবী (সা.) পরম আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, কেননা তারা কেবল পরামর্শ দেয়ার খাতিরে পরামর্শ দেননি, বরং এর কারণ ছিলো পরামর্শদাতাদের কর্ম ও আচরণ আর এই পরামর্শের ওপর সবার পূর্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অঙ্গীকার। যদি পরামর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অঙ্গীকার না থাকে, আর বাস্তবিক অর্থে এর ওপর আমল না করা হয় তাহলে পরামর্শ নিরর্থক। আর আমরা দেখেছি যে, কীভাবে বদরের প্রান্তরে সাহাবীরা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন আর (তার বাস্তবায়নে) নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন। অতএব যেখানেই আমাদের শূরার সদস্যরা রয়েছেন তাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা যেহেতু পরামর্শ প্রদান করেন, তাই সর্বাগ্রে এসব পরামর্শের অনুমোদনের পর তাদের উচিত নিজেদের এর ওপর আমল করার জন্য প্রস্তুত করা। অথবা যুগ খলীফা যা-ই সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন সবার আগে আমাদেরকে তার ওপর আমল করার জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত যখন স্থাপিত হবে তখনই জামা'তের সাধারণ সদস্যরাও সানন্দে এর ওপর আমল করার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে। শূরার সদস্যদের একথা সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক আহমদীর খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার রয়েছে। এর সবচেয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত কর্মকর্তা ও শূরার সদস্যদের স্থাপন করা উচিত, কেননা আপনাদেরকে সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্য করা হয়েছে যা খিলাফত ব্যবস্থা ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাহায্যকারী সংগঠন।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন, যুগ-খলীফাকে যেমন মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে উম্মতের লোকদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং একইসাথে নম্র থাকার ও দোয়া করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে যাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় তাদের জন্যও নির্দেশ রয়েছে যে, সদুদ্দেশ্যে তাকওয়ার পথে থেকে পরামর্শ দেবে। অতএব পরামর্শদাতাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের পরামর্শ সৎ উদ্দেশ্যে এবং তাকওয়ার উন্নত মান অনুযায়ী হওয়া উচিত। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরামর্শদাতাদের অনেক বড় দায়িত্ব হলো এটি আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা যে, তাদের তাকওয়ার মান কেমন? এক্ষেত্রে হযরত আলী (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত সুদূর প্রসারী। তিনি বলেন, **'শাভেরুল ফুকাহাআ ওয়াল আবেদীন'**। অর্থাৎ বিজ্ঞ ও ইবাদতগুযার লোকদের সাথে পরামর্শ করো; সবার সাথে নয়। অতএব এটি হলো (শূরার) প্রতিনিধিদের মাপকাঠি। এতে তাদের জন্যও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যারা শূরার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। অর্থাৎ (তারা) যেন নিজেদের মধ্য থেকে এমন লোকদের নির্বাচন করে যারা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সুপরামর্শদাতা, ধর্মীয় জ্ঞানে উত্তম এবং যাদের ইবাদতের মানও উন্নত। যেখানেই এই মানকে দৃষ্টিপটে রেখে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় সেসব প্রতিনিধির মতামতে এক স্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। আর এটি সেসব প্রতিনিধির দায়িত্ব যে, জামা'তের সদস্যরা যদি সুধারণার বশবর্তী হয়ে কাউকে শূরার প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে তাহলে তাদের এর লাজ রাখা উচিত। একদিনে বা কয়েক সপ্তাহে কেউ জ্ঞানের উন্নত মান এবং ধর্মের গভীরতাকে রপ্ত করতে পারে না, কিন্তু তাকওয়ার পথে থেকে সকল প্রকার স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে যে-কেউ পরামর্শ দিতে পারে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হয়ে, তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করে, দোয়ার সাথে যেসব স্থানে শূরা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানকার প্রতিনিধিদের উচিত নিজেদের

পরামর্শ প্রদান করা; কোনো বক্তার বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে নয় এবং কোনো সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের কারণে অন্যের সুরে সুর মেলানো উচিত নয়। আর কোনো ভীতি অথবা চক্ষুলজ্জার কারণেও নিজের মত পরিবর্তন করা উচিত নয়। বরং তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রেখে জামা'তের স্বার্থকে সকল বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়ে যদি পরামর্শ প্রদান করে, তবেই প্রকৃত অর্থে তারা নিজেদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা জানেন, আর আমাদের সকল কর্মকাণ্ডও তিনি দেখছেন। আমি যদি তাঁর সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিতে রেখে কাজ না করি তাহলে আমি কোথাও আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধভাজন না হয়ে যাই! একইভাবে যেখানে শূরা হয়ে গেছে সেখানে নিজ ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের প্রতি, নিজ আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক অবস্থার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রেখে জীবন যাপন করার অঙ্গীকার করুন এবং যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বা হয়েছে, তাকওয়ার পথে চলে সেগুলো বাস্তবায়ন করা এবং করানোর চেষ্টা করুন–আর এভাবে শূরার সদস্যরা এখন নিজেদের দায়িত্ব পালন করুন। আমরা এমন অবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হলে তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করতে পারব আর আমাদের সিদ্ধান্ত আশিসময় হবে। অন্যথায় আমাদের এক স্থানে একত্র হওয়া এবং নিজ নিজ মতের পক্ষে জোরালো বক্তৃতা করা সেসব জাগতিক সংসদের কার্যক্রমের মতোই হবে যেখানে তাকওয়া নেই, আর যেখানে এমন এমন সিদ্ধান্ত হয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্রকেও পদদলিত করে আর তা আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষারও পরিপন্থী হয়ে থাকে। সেখানে নিজ দলের স্বার্থকে সামনে রাখা হয়। অনেক সময় এসব ভুল সিদ্ধান্তের মন্দ পরিণাম অতি দ্রুতই প্রকাশ পেয়ে যায় যা শান্তি ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করে দেয় এবং কোনো কোনো সময় বিলম্বেও মন্দ পরিণাম প্রকাশ পায়, কিন্তু সেগুলোতে কোনো কল্যাণ থাকে না। যাহোক, এমন সিদ্ধান্ত যা আল্লাহ্ তা'লার বিধান ও শিক্ষামালার পরিপন্থী হয় সেগুলো অবশেষে জাতির ধ্বংস ডেকে আনে। সুতরাং জগতপূজারিদের অবস্থা দেখে হলেও নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

আমি যেমনটি বলেছি, শূরার সদস্যদের প্রস্তাবনা যুগ-ইমামের কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং যুগ-খলীফার নির্দেশেই এ শূরা আহ্বান করা হয়। কাজেই সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মজলিসে শূরা খিলাফতের একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান, আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তের মাঝে খিলাফতের পর এর গুরুত্ব অপরিসীম।শূরার জন্য মনোনীত প্রত্যেক সদস্য এক বছরের জন্য সদস্য হয়ে থাকে। এই গুরুত্বকে তার সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। শূরার এজেন্ডাসমূহ ও পরামর্শের মাধ্যমেই যুগ-খলীফা বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান সমস্যাদি সম্পর্কে অবগত হন। এরপর যেসব পরামর্শ ও মতামত সামনে আসে সেসবের মাধ্যমে সেসব সমস্যা সমাধানের উপায় বা পদ্ধতিও সামনে আসে। অনেক সময় কোনো সমস্যা সমাধানকল্পে কোনো কোনো কথা বা বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হয় না বা শূরার সদস্যদের সামনেই আসে না, কিন্তু খলীফাগণ সেসব বিষয়কেও কর্মবিধিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কোনো কোনো জায়গায় আমিও এ রীতি অবলম্বন করে থাকি। যাহোক, শূরার এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে– শূরার প্রত্যেক সদস্যের এ বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত। এই গুরুত্ব কেবল তিন দিনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি পুরো বছরের জন্য। যে কর্মপন্থাই নির্ধারিত হয় সেটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে শূরার প্রত্যেক সদস্যের পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত; এটি তার দায়িত্ব। এমনটি হলেই জামা'তের উন্নতির বিভিন্ন পরিকল্পনা সঠিক পথে এগুবে আর এসব পরিকল্পনা উত্তমরূপে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। সত্য ও হেদায়েতের প্রসারের যে দায়িত্ব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে আমরা তাতে সহযোগী ও সাহায্যকারী হতে পারব। এমনটি না হলে শূরার সদস্য হওয়া নিরর্থক। এখানে আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করতে চাই যে, বিশ্বের প্রত্যেক দেশে শূরা সাধারণত সে দেশের আমীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর কখনো কখনো মতামত

ব্যক্তকারীরা বক্তৃতা করতে গিয়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন সব শব্দ ব্যবহার করে বসে যা শূরার পবিত্রতার পরিপন্থি। এক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, সদস্যগণ যখনই নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন, তখন বক্তৃতায় আবেগতাড়িত হওয়ার পরিবর্তে, বিবেক-বুদ্ধি বিবর্জিত আবেগী বক্তৃতা না করে উপযুক্ত ভাষায় নিজেদের মতামত ব্যক্ত করুন। অনেক সময় পরামর্শদাতা এমন কথা বলে বসেন যাতে আমেলার সদস্যবৃন্দ বা জামা'তের আমীর, যার সভাপতিত্বে শূরা পরিচালিত হচ্ছে; মনে করেন, পরামর্শদাতা পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে; ফলে সভার সভাপতি হওয়ার সুবাদে বক্তাকে কঠোর ভাষায় থামিয়ে দেয়া হয়, ভর্ৎসনা করা হয়। আমীরদেরও বড়মনের পরিচয় দেয়া উচিত। এই সুধারণা রাখা উচিত যে, বক্তা যা বলছে তা জামা'তের স্বার্থে এবং জামা'তের জন্য সহমর্মিতার প্রেরণায় বলছে। যদি কঠোর বাক্য ব্যবহার করে থাকে বা এমন শব্দ ব্যবহার করে যা শূরার পবিত্রতার পরিপন্থি, তাহলে নম্রভাবে তাকে বাধা দিন। এমন আচরণ প্রদর্শন করবেন না যা থেকে সন্দেহ হতে পারে যে, শূরার সভাপতি বিষয়টিকে আমিত্বের প্রশ্ন বানিয়ে নিয়েছেন। বিশেষভাবে যখন বাজেটের বিষয়ে আলোচনা হয় তখন আবেগের বহিঃপ্রকাশ বেশি হয় আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশয় বা দ্বিধাদ্বন্দ্বও প্রকাশ পায়। এহেন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারী, সেক্রেটারী মাল এবং সভার সভাপতির উচিত ধৈর্যের সাথে কথা শুনে তার উত্তর প্রদান করা। তাকে আশ্বস্ত করা উচিত যে, কীভাবে বাজেট তৈরি হয়েছে, কীভাবে আয় হবে আর কীভাবে ব্যয় হবে আর আয়ব্যয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা কী ইত্যাদি। যে কথা বলে সে জামা'তের স্বার্থ সামনে রেখেই কথা বলে, তাই কোনো কুধারণা পোষণ করা উচিত নয়। তেমনিভাবে এজেন্ডার অন্যান্য প্রস্তাবনা নিয়ে কখনো কখনো ব্যবস্থাপনা ও প্রনিধিরা বৃথা তর্কে জড়িয়ে পড়ে বা একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে যায় যেন তাদের মাঝে ব্যবস্থাপনার ভীতি বিরাজমান। এমন লোকেরাও আমানতের সুরক্ষা করছেন না।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখবেন, প্রতিনিধিবর্গকে জামা'তের সদস্যরা নির্বাচিত করেছেন যথাবিহিত প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আর আমানতের ক্ষেত্রে সঠিক দায়িত্ব পালনের জন্য। তাই কোনো আমিত্বের প্রশ্নও ওঠা উচিত নয়, কিংবা কোনোরূপ ভীতিও থাকা উচিত নয়। সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, মানুষ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশের ভিত্তিতে নির্বাচিত করেছেন যে, تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا অর্থাৎ আমানতসমূহ যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করো। আর যুগ-খলীফাও এটি মনে করেন যে, মানুষ যখন সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের প্রতিনিধি মনোনীত করেছে তাই প্রতিনিধিরাও এ নির্দেশ অনুযায়ীই আমানতের যথাযথ প্রত্যার্পণ করে থাকবেন। আর প্রতিনিধিরা যদি তাদের কর্তব্য শূরা চলাকালীন ও শূরা-পরবর্তী সময়ে পালন না করেন তাহলে তারা কেবল জামা'তের সদস্যদের বিশ্বাসকেই পদদলিত করছে না, বরং আমানত সঠিক স্থানে ন্যস্ত না করে যুগ-খলীফার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। কিন্তু এখানে আরেকটি চিত্রও সামনে আসতে পারে। হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনকারীরাও তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করেনি। আত্মীয়তার কারণে বা বন্ধুত্বের দাবির টানে নির্বাচন করে থাকবেন। যাহোক, যারা এভাবে নির্বাচন করেছে তারা নিঃসন্দেহে পাপ করেছে; এটি অপকর্ম ছিল যা তারা করেছে। তারা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তাদের এস্তেগফার করা উচিত। কিন্তু প্রতিনিধিবর্গ এবং কর্মকর্তাগণ যেহেতু একবার নির্বাচিত হয়ে গেছেন আর ব্যবহারিকভাবে ও আধ্যাত্মিকুার ক্ষেত্রে তারা সেই মানে উপনীত নয় যে মানে তাদের থাকা উচিত, সেক্ষেত্রে এখন এস্তেগফার করে নিজেদের অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের অঙ্গীকার করে এবং তাকওয়ার পথে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে নিজেকে আমানত আদায়ের যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা উচিত। এমন চেষ্টা করলে একদিকে যেখানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করবেন সেখানে হযরত

মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেও সহায়ক হবেন। একই সাথে নিজেদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক মানও উন্নত করবেন। আমি যেমনটি বলেছি, প্রতিনিধিত্বের মেয়াদকাল এক বছর হয়ে থাকে আর এ সময়ের মধ্যে ব্যবস্থাপনার সাথে সহযোগিতাও করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিজেও মেনে চলতে হবে আর অন্যদেরকেও মানাতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বদা তদারকি করুন, আপনার জামা'তে কি এ বিষয়ে কাজ হচ্ছে নাকি হচ্ছে না, বা হলে কতটা হচ্ছে? আর যুগ-খলীফা যেভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন সেভাবে হচ্ছে কি? অতএব, এভাবে আপনাকে যুগ-খলীফার সাহায্যকারী হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন জামা'তে গিয়ে কর্মকর্তাদের অলসতার শিকার হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত কর্মে রূপায়িত হয় না।

অতএব এমন অবস্থায় প্রতিনিধিদের দায়িত্ব কেবল জামা'তের সাধারণ সদস্যদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা নয়, বরং যারা কর্মকর্তা তাদেরকেও তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। কিন্তু এরপরও যদি মনোযোগ নিবদ্ধ না হয় আর এই প্রস্তাব যেভাবে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত ছিল সেভাবে যদি না হয়, তাহলে কেন্দ্রে পত্র লিখুন। অনুরূপভাবে অনেক কর্মকর্তাও শূরার সদস্য হয়ে থাকেন। তাদের নিজ নিজ বিভাগের কাজ দেখাই তাদের একমাত্র দায়িত্ব নয়, বরং শূরার বিভিন্ন প্রস্তাব এবং সেগুলো সম্পর্কে যুগ-খলীফার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হওয়ার বিষয়টি তাদের গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত, তা তার নিজের দপ্তর সংক্রান্ত হোক বা অন্যের। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং আমীরের (এদিকে) দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত এবং আমেলা তথা কার্যকরী পরিষদেও এ বিষয়টি রাখা উচিত। অন্যথায় এমন কর্মকর্তা প্রতিনিধিরা তাদের আমানতের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করছেন না। এ পৃথিবীতে হয়ত তারা কোনো অজুহাত দেখিয়ে পার পেয়ে যাবেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট কোনো বিষয়ই গোপন নেই আর তিনি আমানত রক্ষা করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। অতএব এটি অনেক চিন্তার বিষয়। আমরা শূরার প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা– এসব বলে আমাদের গর্ব করা উচিত নয়, বরং প্রত্যেকেরই নিজ দায়িত্ব নিয়ে ভাবা উচিত।

আমি যেমনটি বলেছি, জামা'তগুলোর কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও যদি শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত না করা হয়ে থাকে, প্রতিনিধিরা যদি চেষ্টা করে আর তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার পরও যদি তারা তা আমলে না নেয়– তাহলে কেন্দ্রকে অবগত করুন। এখনও কিছু লোক এ রীতি অনুসরণ করে থাকে; এমন নয় যে, আদৌ করছে না। কেউ কেউ এ অনুসারে কাজ করে, অর্থাৎ পদাধিকারীরা যদি (শূরার সিদ্ধান্ত) বাস্তবায়ন না করে তাহলে তারা কেন্দ্রকে অবগত করে। কিন্তু সাধারণত তা তখন করে যখন ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে তাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। এ রীতিটি তাকওয়ার রীতি নয়। প্রত্যেক প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা যদি তাকওয়ার ভিত্তিতে শূরার অনুমোদিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করা ও করানোর চেষ্টা করে তাহলে আর কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে না যে, একই প্রস্তাব পরের বছর বা দুই-তিন বছর পর পুনরায় শূরায় উপস্থাপনের জন্য আসবে। পুনরায় প্রস্তাব আসার অর্থই হলো– হয় এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুরোদমে কাজ করা হয় নি, অথবা যেভাবে হওয়া উচিত ছিল সেভাবে হয় নি। কাজেই এমন জামা'ত এবং কর্মকর্তাদেরও চিন্তা করে দেখা উচিত, এটিই কি তাকওয়ার পথে বিচরণ এবং নিজেদের আমানতের দাবি পূর্ণ করার প্রমাণ? এটিই কি খিলাফতের প্রতি আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের চিত্র? দেশের স্থানীয় জামা'তগুলো রয়েছে তারা দেশীয় কেন্দ্রকে এমন সব প্রস্তাব কেবল তখনই প্রেরণ করে যখন তারা দেখে এসব বিষয় হচ্ছে না। যদি হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক স্তরে সকল জামা'তে যদি নজরদারি করা হয়ে থাকে যে, (সিদ্ধান্তগুলো) কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে– তাহলে এসব পরামর্শ পুনরায় আসতই না। এছাড়া দেশীয় কেন্দ্রের যুগ-

খলীফার সমীপে এসব পরামর্শকে এই সুপারিশসহ পাঠানোর প্রয়োজনও পড়ত না যে, এ প্রস্তাবটি যেহেতু এক বা দু'বছর পূর্বে (শূরায়) উত্থাপিত হয়েছিল তাই (এবারের) শূরায় এটি উত্থাপনের সুপারিশ করা হচ্ছে না। এই উত্তর লেখার সময় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনাকে লজ্জিত হয়ে লেখা উচিত যে, আমরা এটি বাস্তবায়ন করাতে পারি নি বলে লজ্জিত। এ বছর আমরা এটি বাস্তবায়ন করব। কিন্তু আমরা যদি বাস্তবায়ন করাতে ব্যর্থ হই তাহলে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হবো এবং যারা আমানতের দাবি পূরণ করছে না তাদের অন্তর্ভুক্ত হবো। তাদের এভাবে লিখিত দেয়া উচিত। এরপর লিখুন, আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে এ বছর এ প্রস্তাবটি উপস্থাপন না করার সুপারিশ করছি। এরূপ করলেই দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হবে। এর ফলে ব্যবস্থাপনা ও প্রতিনিধিদের মাঝেও অন্তত এতটুকু উপলব্ধি জাগ্রত হবে যে, তারা বড় বড় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে যুগ-খলীফার সমীপে উপস্থাপন করে যে, আমরা হেন করব তেন করব কিন্তু পরে সেটি বাস্তবায়নে কাজই করে না। অতএব তারা অপরাধী এবং যুগ-খলীফার আস্থার জায়গায় আঘাত করেছে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে সমষ্টিগত আত্মজিজ্ঞাসা দরকার সেখানে ব্যক্তিগতভাবেও কর্মকর্তাদের এবং শূরার প্রতিনিধিদের আত্মবিশ্লেষণ ও এস্তেগফার করা উচিত, আর এরপর এটি বাস্তবায়ন না করার কারণগুলো সকল স্তরে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা উচিত। অতএব এরূপ বিশ্লেষণই জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। অন্যথায় মুখের কথায় কোনো লাভ হয় না। স্থানীয় পর্যায়ে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে, কোনো কোনো সক্রিয় জামা'ত শূরার প্রস্তাবনা শতভাগ না হলেও সত্তর বা আশিভাগ বাস্তবায়ন করে এবং একাগ্রচিত্তে করে। কেননা (তারা ভাবে) যুগ-খলীফার অনুমোদন সাপেক্ষে আমরা এই কর্মপরিকল্পনা পেয়েছি আর যুগ-খলীফার আস্থার আমরা অবমূল্যায়ন করব না। তাই দেখা উচিত যে, কী সেই প্রেরণা যার কল্যাণে এই জামা'তের সদস্যদের মধ্যে এই বিপ্লব সাধিত হয়েছে? এমন সক্রিয় জামা'তগুলোর কর্মকর্তাদের সাথে দুর্বল জামা'তগুলোর কর্মকর্তাদের বৈঠক করানো উচিত, বরং কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করানো উচিত এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কোনো জায়গায় যদি একটি জামা'তও সক্রিয় এবং নিজেদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচীতে সক্রিয় হয়ে থাকে তাহলে অন্য দশটি জামা'তকে তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপকৃত করতে পারে। কিন্তু মূল বিষয় হলো, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় যদি প্রত্যেক সেক্রেটারি এবং পদাধিকারী ও শূরার প্রতিনিধিরা নিজেদের ভূমিকা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে তাহলেই এটি সম্ভব।

কিছু জামা'ত বা দেশ এই পর্যালোচনাও করেছে আর এর সুফল পেয়েছে যে, বিগত তিন বছরে শূরার সিদ্ধান্ত কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে? তারা এর ত্রৈমাসিক পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন কেন্দ্রে পাঠিয়ে থাকে। এ থেকে (বুঝা যায়), তাদের মাঝে এই দায়িত্ববোধ রয়েছে যে, এ প্রস্তাবটি দুই বছর পূর্বে উপস্থাপিত হয়েছিল এজন্য এখন আর এটি উপস্থাপিত হবে না– একথা বলে আমরা বসে থাকব না; বরং এই রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাতে হবে যে, এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা এতটুকু লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি আর চেষ্টা অব্যাহত আছে। এর ফলে এ ধরনের জামা'তগুলোর দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু কথার ফুলঝুরিতে আমরা বিশ্বজয় করতে পারব না, বরং এর জন্য কর্মের প্রয়োজন রয়েছে। যেখানে বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে সেখানে ব্যবহারিক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে, ইবাদতসমূহের ক্ষেত্রে উচ্চমানে উপনীত হতে হবে। কর্মকর্তা ও শূরার প্রতিনিধিরা যদি নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং মসজিদগুলো আবাদ বা (নামাযীতে) পরিপূর্ণ করার বিষয়ে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাহলে মসজিদের নামাযীর সংখ্যাও তিন থেকে চার গুণ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রেও আমাদের আত্মপর্যালোচনা করতে

হবে। অতএব নিজেদের ব্যবহারিক আচরণ, মানুষের সাথে স্নেহ ও ভালোবাসার সম্পর্ক, তাদের জন্য হৃদয়ে মমতা রাখা এবং তাদের ও নিজেদের জন্য দোয়া করা, অধিকন্তু যুগ-খলীফার আনুগত্যের মান উন্নত করা যদি প্রত্যেক কর্মকর্তা ও শূরার সদস্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হয় কেবল তবেই জামা'তের মাঝে আমরা সামগ্রিকভাবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করব। আমাদের ওপর গুরুদায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এবং তাঁর মিশনের বাস্তবায়ন কোনো সামান্য কাজ নয়। ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর বাণী বিশ্ববাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে জগদ্বাসীকে এক-অদ্বিতীয় খোদার পূজারি বানানো নিরন্তর প্রচেষ্টার দাবি রাখে। বিশ্বের সব দেশে শূরা আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা সংশোধনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি এক আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের জন্য এবং বিশ্ববাসীকে এক উম্মতে পরিণত করার মানসে, মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করার উদ্দেশ্যে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যা একটি বিপ্লব সাধন করবে। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, এ সমস্ত কর্ম সম্পাদনের জন্য তহবিল প্রয়োজন, অর্থের প্রয়োজন। কাজেই নিজেদের আর্থিক বাজেটও এমনভাবে প্রণয়ন করুন যেন ন্যূনতম খরচে আমরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারি। জামা'তের অধিকাংশ সদস্যই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। এজন্য চাঁদা থেকে যে আয় হয় তা ব্যয়ের এমন সুন্দর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যেন আমরা সর্বনিম্ন খরচে ধর্মের সর্বোচ্চ প্রচার ও প্রসারের কাজ সম্পাদন করতে পারি। এ কাজ আমরা তখনই করতে পারব যখন আমরা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো যে, আমাদেরকে তাকওয়ার পথে চলে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করতে হবে এবং ধর্মের সেবাকে ঐশ্বরিক অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকওয়ার পথে চলার উপদেশ দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا وَيُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ

তিনি (আ.) আরো বলেন,

وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نُورٗا تَمۡشُونَ بِهِۦ

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যদি তাকওয়ায় অবিচল থাকো এবং আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচল থাকো তাহলে খোদা তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে এক পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন। আর সেই পার্থক্য হলো তোমাদেরকে এমন এক জ্যোতি দেয়া হবে যে জ্যোতিতে তোমরা তোমাদের সকল পথে বিচরণ করবে। অর্থাৎ সেই জ্যোতি তোমাদের সকল কথায়, কাজে এবং শক্তিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়তে সঞ্চারিত হবে। তোমাদের বিবেকবুদ্ধিতেও জ্যোতি থাকবে এবং তোমাদের একটি আনুমানিক কথায়ও জ্যোতি থাকবে। এছাড়া তোমাদের চোখেও জ্যোতি থাকবে আর তোমাদের কান ও তোমাদের জিহ্বা এবং তোমাদের বক্তব্য– এক কথায় তোমাদের প্রতিটি গতি ও স্থিতিতে জ্যোতি থাকবে আর যে পথে তোমরা হাঁটবে সেগুলোও জ্যোতির্মণ্ডিত হয়ে যাবে। মোটকথা তোমাদের যত পথ রয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের শক্তিবৃত্তির পথ হোক বা তোমাদের ইন্দ্রিয়ের পথ হোক, সব জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে এবং তোমরা আপাদমস্তক আলোতেই বিচরণ করবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তাকওয়ার পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে আমাদের দায়িত্বাবলী পালন করার তৌফিক দিন। তিনি আমাদের ভুলত্রুটি, ঘাটতি ও দুর্বলতা ঢেকে রেখে স্থায়ীভাবে আমাদেরকে স্বীয় কৃপায় ধন্য করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)